চিরকুট ৩৮

পড়ে বেশ মজা লাগলো, যদিও বিষয়টা দুঃখজনক। ঘটনাস্থল টরন্টো, ক্যানাডা। বাংলাদেশের মানুষদের মাঝে মধ্যেই দুঃখ করে বলতে শুনা যায় - চোর-বাটপাড়ে দেশ ভরে গেল। তাদের ধারনা পশ্চিমা দেশগুলোতে তেমনটা হয় না। তাই যখন কেহ শুনেন যে ক্যানাডার বাসায়ও চুরি হয় - তখন তারা অবিশ্বাস্য নয়নে তাকিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম আমারও তেমনটা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের দিকের কথা, তখনও ক্যানাডায় স্বপ্নময় সময় চলছিলো - একদিন আমার এক বন্ধু ফোন করে তাড়াতাড়ি তার বাসায় যেতে বললো। গিয়ে দেখি ভয়াবহ অবস্থা। বন্ধু পত্নী গিয়েছিলেন শপিংএ আর বন্ধু তার বেড়াতে আসা আরেক বন্ধুকে নিয়ে শহর দেখতে গিয়েছেন। ফিরে এসে দেখে তার বাসায় আর বসবাসের অবস্থায় নেই। চোর দরজা ভেঙে ভিতরে গিয়ে সব তছনছ করে ফেলে রেখেছে। চোর যদিও তেমন কিছু নেয়নি,সব কিছুই ফেলে গিয়েছে - শুধু মাত্র মুভি ক্যামেরা, গয়না আর কিছু ডলার ছাড়া - কিন্তু এগুলো খুঁজতো সমস্ত বাসাটা একটা গার্বেজ ডাম্প বানিয়ে ফেলেছে। পরে আরো এক বন্ধুর বাসায় চুরি হলো। এ ক্ষেত্রে বন্ধু পত্নী কোন ঝুঁকি না নিয়ে সব গয়না ব্যাঙ্কে রেখে দেয়ায় চোর তেমন কিছু নিতে পরেনি। তবে বাসার অবস্থা বেজায় খারাপ করে রেখে গিয়েছিল। রান্না ঘরের সব খাবার মেঝেতে ফেলে তার উপর সব কাপড়-চোপড় দিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থা করে রেখেছিল। তবে বেশী খারাপ অবস্থা ছিল বাসার দেয়ালের। দেওয়ালে মনুষ্য বর্জ্য দিয়ে নানান বর্ণবাদী কথা লেখে আর্ট ওয়ার্ক এর প্র্যাকটিস করেছে চোর।

যাই হোক - আসল কথা থেকে সরে এসেছি। যে খবরটা পড়ে মজা পেলাম তা বলি। টরন্টোর এক মলের পার্কি লটে এক জন লোক আরেক জনকে একট লটারী টিকেট দেখিয়ে বললো - এটা এক মিলিয়ন ডলারের বিজয়ী টিকেট। সে বিদেশী এবং অবৈধ ভাবে বসবাস করার কারনে সেই টিকেট ক্যাশ করতে পারবে না। সুতরাং কিছু মুল্য পেলে সে টিকিটটা বিক্রয় করে দেবে। এরই মধ্যে অন্য একজন এসে আলোচনায় যোগ দেয়। সে টিকিটের নাম্বার নিয়ে সেল ফোনে কল করে লটারী কর্পোরেশনের হট লাইনে। নাম্বার মিলায় প্রথম জনকে নিয়ে। তারপর দ্বিতীয় জন অর্ধেক টাকা দিতে রাজী হয়ে গেলে প্রথমজন আর অবিশ্বাস করতে পারে না। সমস্যা হলো প্রথমজনের কোন নগদ অর্থ না থাকায় ক্রেডিট কার্ডে কিছু কিনে দিতে রাজী হয় এবং তারা সবাই মিলে লটারীর মালিকের গাড়ীতে করে ঘুরে ঘুরে পনের হাজার ডলারের বাজার করার পর - ২য় ব্যক্তি একটা ব্যাঙ্কের ঢুকে একটা প্যাকেট নিয়ে বেড়িয়ে এসে বলল যে সে তার ভাগের ১৫ হাজার ডলার নিয়ে এসেছে। তারপর ২ জন নেমে গেল লটারীর টিকেটটা ফটো কপি করার জন্যে। এই সময় ২য় ব্যক্তি অসুস্থতার ভান করে ১ম ব্যক্তিকে ফটোকপি করে নিয়ে আসার অনুরোধ করে গাড়ীতে ফিরে যায়। সে ফিরে এসে আর গাড়ীটাকে দেখতে পায় নি এবং পরে লটারী অফিসে গিয়ে পুরষ্কার দাবী করে জাল লটারী বহনের দায়ে পুলিশের হাতে ধরা পরে বেচারার মিলিয়নিয়ার হবার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

যতবার লোকটার কথা মনে হয়েছে ততবার কষ্ট লেগেছে। এই রকম মানুষের সংখ্যা কিন্তু খুব কম নেই ক্যানাডাতে। এখানে মিলিয়নিয়ার হবার আশায় মানুষ নিয়মিত লটারীর পিছনে অর্থ ব্যয় করে। সরকারী একটা বিভাগ আছে যারা সমস্ত লটারী আর ক্যাসিনোগুলো চালায়। এছাড়া আছে বিভিন্ন সেবা সংস্থা, হাসপাতালের লটারী। ক্যানাডাতে প্রতি বৎসর মানুষ মাথাপিছু ২৬২.৩০ ডলার হারে মোট ১২ বিলিয়ন ডলার খরচ করে লটারী কিনে আর আমেরিকায় ১৮৩.৭০ ডলার হারে ৪৮.৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে মিলিয়নিয়ার হওয়ার আশে। এখানে বলে রাখা ভাল এই হিসাবে কিন্তু জুয়ার হিসাব নেই। সেটা আবার অন্য খাতে হিসাব হয়। জুয়া খেলার জন্যে এখানে চমৎকার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এমনকি আপনি নায়েগ্রা ফলসের পাশে ক্যানাডার বৃহত্তম ক্যাসিনোতে যেতে ফ্রী বাস পাবেন টরন্টো থেকে। কিন্তু বিষয়টা সব সময় নির্মল আনন্দ হিসাবে থাকে না। মানুষ নেশাসক্ত হয়ে সর্বশ্রান্ত হয় - অনেকে দেউলিয়া হয়ে পাগল হয়ে যায়। অনেক মেয়ে ঋনের ভারে পতিতাবৃত্তির মতো কাজে নেমে যায়। ক্যানাডাতে ৪% আত্মহত্যার কারন হচ্ছে জুয়া খেলা Canada West Foundation নামের একটা প্রতিষ্ঠান বলছে "High social costs are paid when individuals become problem gamblers, who are more likely to lose a job, suffer depression, have a nervous break-down, default on debts, pass bad cheques, divorce and attempt suicide." /কিন্তু রাষ্ট্রের একটা বিরাট আয়ের উৎস বলে সরকার একরকম দেখে না দেখার ভান করে।

দেশে যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতাম সেখানে ৩৪টা সমিতির অস্তিত্ব ছিল। শ্রমিক, প্রকৌশলী, আধা-কৌশলী, কারিগর, বৃহত্তর জেলা, ক্ষুদ্রতর জেলা, সমবায় - এমনকি উপজেলা সমিতিও ছিল। একসময় আমাদের এক সহকর্মী ৩৫ নাম্বার সমিতি তৈরীর প্রস্তাব নিয়ে এলে তার কথা শুনে অবাক হওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না। যে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কমপক্ষে তিনটা আর বেশী হলে পাঁচটা সমিতির সদস্য ছিলেন। যেমন ধরুন আপনি মুন্সীগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহন করেছেন সুতরাং আপনি জেলার বৃহত্তরও সংস্করন ঢাকা জেলা সমিতির সদস্য হবেন - হয়তো মুন্সীগঞ্জ জেলা সমিতি থাকলে তারও সদস্য হবেন। তারপর আপনি পেশাগত সমিতি - যেমন অকারিগরী বা কারিগরী সমিতির সদস্য হবেন। যদি ইচ্ছা করেন তবে সমবায় সমিতির সদস্যও হতে পারেন। তারপর যদি আপনার উপজেলার কিছু উৎসাহী মানুষ থাকে তবে সেখানে একটা সমিতি জন্মের সম্ভাবনা থাকে এবং জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত অধিকারে আপনি সে সমিতির সদস্য হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একজন কর্মচারী/কর্মকর্তা গড়ে চারটা সমিতির সদস্য হওয়ার সুবাদে যদি মাসে প্রতি সমিতির জন্যে কমপক্ষে দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করেন তবে ৫০০০ কর্মচারীর গড়ে প্রতিদিনের বেতন ১৫০ টাকা হিসাবে বৎসরে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তা ছাড়া সমিতির কর্মকর্তারা কখনও অফিসের কাজ করে না। তাদের বেতন এবং বাৎসরিক সন্মেলন এবং বিভিন্ন উৎসব হিসাব করলে এই ব্যয় গিয়ে ১.৫ কোটি টাকা হবে। এটা তো শুধু মাত্র একটা ছোট সংস্থার বেতনের হিসাব। সমিতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় যে পরিমানের অব্যবস্থা আর অপচয় হয় তার হিসাবটা হবে বিরাট। ঢাকার কোন সরকারী বা সংস্থার দপ্তর পাওয়া যাবে না যা এই ধরনের সমিতির মহামারী থেকে মুক্ত। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসে, জনগনের কষার্জিত সম্পদের বিরাট অপচয়ের কারন এই ধরনের সমিতির জন্ম এবং পরিচর্চা কেন করতে দেওয়অ হয়? অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষনের পর সমিতিগুলো জন্ম ও কার্যকর থাকার পিছনের মুল কারন সমুহ সংক্ষেপে বলা যায় ঃ

১) একটা দলবদ্ধ শক্তি অর্জনের মাধ্যমে সকল নিয়মনীতিকে প্রভাবিত করে সুবিধা আদায় করা, যথা বদলী, প্রমোশন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সমিতিগুলো বিশেষ ভুমিকা রাখে।
২) রাজনৈতিক দলগুলোর শাখা হিসাবে কাজ করা, বিশেষ করে এলাকা ভিত্তিক জনপ্রতিনিধির সমর্থক হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রভাব বিস্তার করা। বিনিময়ে ক্ষমতাশীন হলে সেই দলের প্রভাব ও শক্তি ব্যবহার করে অবৈধ সুবিধা আদায় করা।

সমিতিগুলোর প্রভাবে মুলত যা হয় তা হলো কর্মহীনতা, শ্রমের অপচয়, প্রশাসনিক কাজে অনিয়ম এবং দুনীতি, দালালী ও পেশীশক্তির প্রধান্য বিস্তারে মাধ্যমে মেধার অবমুল্যায়ন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা এই সব বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। তারপরও বাংলাদেশকে এই বাস্তবতা মেনেই চলতে হবে - কারন প্রশাসনের উচ্চপর্যায় থেকে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত সবাই এই সর্বনাশা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। তারপরও আশা করবো বাংলাদেশের সরকারী এবং সংস্থার মধ্যে আঞ্চলিক সংগঠন নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশে একটা দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরীর লক্ষ্যে কেহ না কেহ কখনও কাজ করবেন।

অন্য আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে বিদেশে বা প্রবাসে সমিতি। আমাদের বসতি টরন্টো শহরে প্রায় অর্ধ শত সমিতি আছে। এখানে অবশ্য প্রবাসের আওয়ামীলীগ ও বিএনপি শাখাকে সমিতি হিসাবেই বিবেচনা করা যায়। কারন আঞ্চলিক সমিতির কার্যকলাপ আর তাদের কাজের কোন রকমভেদ নেই। তাদের মুল কাজগুলো হচ্ছে - ১) বনভোজন ২) স্থানীয় বাংলা পত্রিকা গুলোতে বিজ্ঞাপন দেওয়া ৩) মাঝে মধ্যে কিছু দিবস পালন করা ৪) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ৫) বাংলাদেশে থেকে সফরকারী কোন স্বনামখ্যাতদের সম্বর্ধনা দেওয়া ৬) সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদকের মধ্যে বিবাদ - বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কাঁদা ছোড়াছুড়ি এবং পরে অন্য আরেকটা সমিতির জন্ম দেয়া।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে কিছু মানুষ প্রতিনিয়ত সমিতির কাজ করে যাচ্ছে আর বেশীর ভাগ মানুষ এর থেকে বিচ্ছিন্ন। সাধারন মানুষ অবশ্য সমিতির কিছু কিছু কর্মকান্ড যেমন বনভোজন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করলেও তাদের বিবাদ বা কোন্দলে তেমন বিশেষ একটা মাথা ঘামায় না। বাংলাদেশের মতো এখানেও দেখা যায় কোন কোন নেতা একাধিক সমিতির সাথে জড়িত। তেমনই একজন ভদ্রলোকে জানি যিনি “বাংলাদেশী কৃষিবিদ সমিতি”, “বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি”, “বি-বাড়িয়া সমিতি”, “হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ”, “সার্বজনীন পুজা কমিটি”, “মন্দির কমিটি”, “হিন্দু কালচারাল সোসাইটি” এবং ফোবানা-র নেতৃত্ব পর্যায়ে অবস্থান করছেন। আবার অনেক নেতা আছেন দল বদল করেন এবং সেটা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে জানান। মজার বিষয় হচ্ছে এখানে আওয়ামী লীগ

আছে চারটা, বিএনপি তিনটা, বঙ্গাবন্ধু পরিষদ ২/৩টা, জিয়া পরিষদ দুইটা - যারা প্রতিনিয়ত দেশের থেকে কাগজপত্র এনে পত্রিকায় ছাপিয়ে প্রমানের চেষ্টা করেন যে তাদেরটাই খাঁটি আর অপরপক্ষ ভেজাল।

প্রশ্ন আসে প্রবাসে সমিতি করার পিছনে কারন কি? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সমিতিগুলোর ভাঙনের কারনের পিছনেই সমিতি তৈরীর কারনসমূহ নিহিত আছে। তাহলে আসুন দেখি সমিতিগুলো ভাঙ্গার পিছনের কারন সমূহ একটু দেখা যাকঃ

১) *সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব* - কোন সাময়িক কারনে সমিতির জন্ম হলেও সুনির্দিষ্ট এবং দুরবর্তী লক্ষ্য না থাকায় স্বল্পকালের মধ্যেই এদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।
২) *নেতৃত্বের কোন্দল* - কারন আর্থিক অসচ্ছতা এবং অনিয়ম।
৩) *পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ* - কারন হীনমন্যতা।
৪) *সাধারন মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতা* - কারন বেশীর ভাগ মানুষ দৈনন্দিন জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সমিতি করার মতো অর্থহীন কাজে সময় ব্যয় করাটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে।
৫) *স্থানীয় বাংলা পত্রিকাগুলোর ইন্দন* - দেখা যায় সামারে (গরমকালে) প্রচুর সামাজিক কর্মকান্ড হওয়ার সুবাদে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে টু-পাইস কামাই ভাল হওয়ায় পত্রিকার মালিক সম্পাদকরা বেশ খোশ মেজাজে থাকেন। কিন্তু শীতে তাদের ব্যবসা খারাপ থাকায় বিজ্ঞাপন লাভের আশায় সমিতির নেতাদের পরষ্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। প্রথমে প্রেস রিলিজ এবং পরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরস্পরে বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা চলার পর নতুন আরেকটা সমিতির জন্ম এবং নবজাতক সমিতির কমিটির নাম ঘোষনা আর অভিষেক ইত্যাদি নিয়ে পুরো শীতকালটা বিজ্ঞাপনের ব্যবসা বাচিঁয়ে রাখা হয়।
৬) *নিজেকে প্রচারের প্রচেষ্টা* - দেখা যায় বাংলাদেশে কোন নেতা বা ব্যক্তিত্ব (সেলিব্রটি) যখন প্রবাসে আসেন - তাদের পিছনে একদল মানুষ আঠার মতো লেগে থাকেন। তাদের খাবার ও বাসস্থানে ব্যবস্থার মাধ্যমে কেহ হয়তো লাইমলাইটে চলে আসেন আর অন্যরা ঈর্ষান্বিত হয়ে কুৎসা রটনা শুরু করেন। শুরু হয় ছবি তোলা আর তা বাঁধাই করে দেওয়ালে টাঙগানোর প্রতিযোগীতা। একজনের বাসায় গিয়ে দেখলাম নৈশকালীন পোষক পড়া পতিত স্বৈরাচার এরশাদের সাথে ভদ্রলোকের গিন্নির ছবি স্বযত্নে বৈঠকখানার দোয়ালে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন। যতটুকু জানি ভদ্রলোক দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন যাপন করায় হয়তো এরশাদ সম্পর্কে তেমন ভাল জানেন না। জার্মানীতে তার বাসার পাশে এরশাদ কয়েকদিন থেকে ছিলেন এবং অন্যান্যদের সাথে গড্ডালিকায় তিনি ছবি তোলে তা বাঁধাই করে টাঙ্গিয়ে রাখেন।

মোট কথা হচ্ছে - কিছু মানুষের অনুৎপাদনশীল চিন্তার ফসল হচ্ছে প্রবাসী সমিতি গুলো - যা প্রবাসীদের উপকারের চেয়ে অপকার বেশী করছে। প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের জন্যে একটা কৃত্রিম সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরী করে মুলধারার থেকে প্রবাসীদের বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে সমিতিগুলো বিশেষ ভুমিকা রাখছে। উদাহরন হিসাবে বলা যায় - সামারে যখন মুলধারার পরিবাগুলো সন্তানদের বিভিন্ন শিক্ষামুলক ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেন বা শিক্ষামুলক সফরের ব্যবস্থা করেন - তখন বাংলাদেশী পরিবারসমূহ বনভোজন বা গানের অনুষ্ঠানে সন্তানদের নিয়ে যায়। যা পরবর্তীতে বাচ্চাদের স্কুলে বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কেহ কেহ হয়তো বাঙালী সংস্কৃতিকেই ধারন করে কিন্তু বেশীরভাগই মুলধারার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসীদের সাথে প্রথম প্রজন্মের একটা বিরোধ তৈরী হচ্ছে। ফলাফল হিসাবে দেখা যাচ্ছে পরিবারগুলোতে বাবা-মা আর ছেলে মেয়ের মধ্যে বিশাল দুরত্ব তৈরী হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে - শুধুমাত্র পারষ্পারিক ভুল বুঝাবুঝির কারনে। এই প্রসংগে একটা উদাহরন দেওয়া যাক। টরন্টোতে আমরা ক'জনা সাহিত্য পরিষদ নামে একটা সংগঠন ছিল। কিভাবে যেন খবর পেয়েছে আমি লিখি। সুতরাং তারা মনে করে বসলো আমি একজন সাহিত্যিক (?) এবং আমাকে তাদের মাসিক সাহিত্য সভায় দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। একদিন আমাকে কিছু বলতে বলা হলে আমি যা বললাম তাতে তারা বেশ বিরক্ত হলো। আমাকে পরে আর দাওয়াত দেওয়া হয়নি। আমার বক্তব্য ছিল - ক্যানাডায় বসে সাহিত্য নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় তবে কেন শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবো - কেন ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে নয়। পরে আমি তাদের অনুরোধ করলাম এই বলে যে আমার ছেলের সাথে যোগাযোগ চালু রাখার জন্যে আমাকে কানাডীয় সাহিত্য সম্পর্কে অল্পস্বল্প খবরাখবর রাখতে হবে এবং এ জন্যে হয়তো আমাকে একটু বেশী সময় ব্যয় করতে। কিন্তু আমি আনন্দিত এই ভেবে যে - বাংলার বাইরেও আমি আরো একটা সাহিত্য নিয়ে কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারবো। তাদের অনুরোধ করলাম - তাদের সন্তানদের স্বার্থে যে তারা তাদের আলোচ্যসুচীতে ক্যানাডিয়ান সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন নতুবা তাদের সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে এমন একটা নাম রাখেন যাতে বুঝা যায় যে

তাদের কার্যক্রম শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা কথা রেখেছেন। এখন সংগঠনটির নাম রেখেছেন "বাংলা সাহিত্য পরিষদ"। এখনও তারা রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জন্মজয়ন্তী পালন করে এবং পত্রিকার খবরে শেষে থাকে ....ভাবীর রান্না মজাদার নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ভাবি বেচার ... ভাবীকে না কতটা তোষামোদ জরুরী - যে কবিতা না পড়েও তার নাম পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এখানে বলা ভাল - এই অনুষ্ঠানের খবর পত্রিকায় ছাপানোর পুর্বশর্ত হচ্ছে কয়েক সপ্তাহ ঐ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানো।

প্রবাসী সমাজের জন্যে ক্ষতিকর এই সমিতিগুলো কি কখনও বন্ধ হবে বা তাদের বোধদোয়ের ফলে তারা তাদের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাশ করে মুলধারা সাথে একাত্ব হওয়া চেষ্টা করবে? বলা কঠিন, অন্তত প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীদের থেকে সেই আশা নেই বলেই আপাতত মনে হচ্ছে।

পুনঃ - যখন শেষের পর্যায়ে লেখাটা নিয়ে এসেছে এই সময় একটা ফোন এলো। ফোনের বিষয় - একটা নতুন সমিতির জন্ম হবে আগামীকাল। নাম হবে *"বঙ্গাবন্ধু ফাউন্ডেশন ক্যানাডা"*। যে ভদ্রলোক ফোন করলেন তিনি বঙ্গাবন্ধু পরিষদ ক্যানাডার সাবেক সভাপতি। এরই মধ্যে আরো দু'টা বঙ্গাবন্ধু পরিষদ জন্ম নেওয়ায় কারনে তিনি কিছুদিন হাইবারনেশনে থাকার পর আবার জেগে উঠেছেন। আরো একটা সংগঠন বাড়লো টরন্টোতে - পত্রিকাওয়ালাদের আরো কিছু নগদ অর্থ আর কিছু মানুষের মুল্যবান সময়ের অপচয়ের পথ খুললে গেল।

(৩)

যদিও কখনও সৌদী আরবে যাইনি - তবে বুঝা যাচ্ছে সেখানকার প্রবাসীরাও সমিতি সিন্ড্রোম থেকে মুক্ত নন। সৌদী প্রবাসী সংবাদসেবী এবং লেখক ভাইয়েরা, আপনারা কতজন সংবাদদাতা আছেন সৌদী আরবে? ১০ জন বা ১৫ জন। আপনাদের কোন্দলের খবর ইন্টানেটের বদৌলতে বিশ্ববাসী জানছে। এটা কি আপনাদের জন্যে লজ্জা নয় কি? নামে বেনামে কুৎসা রটনা করে নিজেদের হেয় না করে নিজেরা বসে নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটানো কি শোভন হবে না? এমন কিছু করুন যাতে আমরা আপনাদের নিয়ে গর্বিত হই। অযথা সমিতির সংখ্যা না বাড়িয়ে মেধার মুলায়ন করুন- দেখবেন সমস্যার সমাধান কত সহজ। আর একটা পরামর্শ দেই - দয়া করে ভুল বুঝবেন না। নিজে কম বলে অন্যের কথা মনযোগ দিয়ে শুনুন। আর মরুপলাশ সম্পাদককে কে বলছি, একটু লক্ষ্য করুন - আপনার তৈরী সমিতিগুলো কোন্দলে বিপর্যস্থ - পরস্পরের কাঁদা ছোড়াছুড়িতে সদালাপ কাঁদাময় - এ অবস্থায় ইন্টানেট সম্পাদকদের সমিতি করার মতো প্রস্তাব আপনার মাথা আসে কি করে? দয়া করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ মিটান আর আপনার চমৎকার ওয়েবসাইট মরুপলাশকে সার্বিকতা দানের চেষ্টা করুন। একটা ওয়েব পেজের পুর্নঙ্গতা প্রদানের জন্যে প্রচুর সময় আর মেধা ব্যয় করা দরকার । আশা করি এই বিষয়ে সবাই আপনাকে সহায়তা দিবেন - এ জন্যে সমিতির তেমন প্রয়োজন নেই বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি বিষয়টা নিয়ে ভাল ভাবে ভাববেন।

(৪)

১৯৯০ সালে ১৫ই আগষট রাজবাড়ী জেলা শহরে এক মাঠে মাইকে হিন্দি গান বাজিয়ে বিশাল প্যান্ডেল করে "জালিম মুক্তি দিবস পালন করছিল কিছু ফ্রীডম পার্টির সমর্থক। আমরা কয়েকজন হেটে যাচ্ছিলাম - তাদের কয়েকজন দৌড়ে এসে আমাদের দাওয়াত দিল। পাঠক - বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থা। ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম - শেক মুজিবকে জালেম বলছেন কে? তার উত্তরে সে বলেছিল - শেখ সাহেব আর তার দুই ছেলে মিলে দেশটাকে ছারখার করে দিয়েছে, কোটি কোটি টাকা বিদেশের ব্যাংকে পাঠিয়েছে, দেশটাকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবতে অবাক লাগে ৩০ বৎসর পরও আমাদের অনেকে একই কথা বিশ্বাস করেন।

১৯৭১ সালের বিশাল যুদ্ধের একজন বিশাল জনপ্রিয় নেতাকে হঠাৎ করে মারা ঠিক হবে না তাই একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার জনপ্রিয়তাকে কমানো হয়েছে। সেই কর্মপন্থার মধ্যে ছিল রাজনৈতিক, প্রচার মাধ্যম আর প্রশাসনে লুকিয়ে থাকা পরাজিত শক্তি। অনেকে বিশ্বাস করেন বাকশাল সৃষ্টির জন্যে শেখ মুজিব মারা গেছেন।একটা কথা তারা মনে করতে পারছেন না যে সে সময় কেন - বাংলাদেশে কখনই বাকশাল কায়েম হয়নি। যাই হোক - ৩০ বৎসর পর যদি আমরা পিছনে ফিরে দেখি তাহলে আমাদের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর কি পাওয়া জরুরী মনে হয় না। যেমন -

১) স্বাধীনতার পর পরই যুব সমাজকে টার্গেট করে হঠাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে জাসদের জন্ম হলো কেন? কোথা থেকে কারা বিপুল অস্ত্র আর অর্থ পেল? ৭ই নভেম্বর তথাকথিত সিপাহী বিপ্লবের পর দল মানুষের ক্ষমতা গ্রহনের পালা শেষ হলে কেন জাসদ ধীরে ধীরে বিগত হতে লাগলো? কারন কি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন শেষ হয়েছিল?
২) জাসদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বললেও তাদের মুল টার্গেট কেন শেখ মুজিব ছিল?
৩) সেই সময়ে প্রচারিত গনকন্ঠ আর হক কথা পরে আর কেন প্রচারিত হচ্ছে না, কারন কি মিশন শেষ হওয়ায় তাদের অর্থ যোগান বন্ধ হয়ে যায়?
৪) গনকন্ঠে প্রচারিত শেখ কামাল সম্পর্কে খবর অনুসারে তার কোটি কোটি টাকার সম্পদ থাকার কথা, কিন্তু ত্রিশ বৎসরে মধ্যেএ বাংলাদেশের মানুষকে সেই সম্পদের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান থাকতে হয়।
৫) শেখ জামাল সম্পর্কে হক কথা আর গনকন্ঠে প্রচুর কাহিনী প্রচারিত হয় - কিন্তু তার মারা যাবার ত্রিশ বৎসর পরও তার পক্ষে তেমন সত্যতা মিলে না বরঞ্চ তার সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় সে একজন নিরিহ সাদাসিধা মানুষ ছিলেন।

এই তো গেল পিছনে ফিরে দেখার কিছু কথা। তা ছাড়াও দেখতে হবে কারা কারা শেখ মুজিবকে মেরে লাভবান হয়েছে। এক নাম্বারে যে নাম আসে তা হলো - পুজিঁর অগ্রগামী বাহিনী আমেরিকা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শেখ মুজিব মারা যাওয়া এবং জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের সময়কালে পৃথিবীর ৬২টা দেশে সামরিক শাসন চালু হয়েছে। অত্যান্ত পরিকল্পিত ভাবে জাতীয়তাবাদী নেতাদের হত্যা করে পৃথিবীর একটা বিশাল মানব গোষ্ঠীর বিকাশকে রোধ হরা হয়েছে। পঙ্গু করা হয়েছে সে দেশে গুলোর অর্থনীতিকে। যার ফলশ্রুতিতে দেখি কুদ্দুস খানেরা বিশ্বাস করেন আমেরিকা না থাকলে পৃথিবীতে স্বৈরশাসক বা কমিউনিষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করতে পারতো। লক্ষ্য করবেন তাদের ট্যানেল-ভিশনটা কতটা প্রিফরমাটেট। আমেরিকার কাছের কিউবা বা চীন এখনও কমিউনিষ্ট শাসনের অধীনে সেটা নিয়ে আমেরিকার তেমন মাথা ব্যাথা নেই - অন্যদিকে মিশর বা সৌদী আরবে বা পাকিস্থানে স্বৈরশাসকদের ক্ষমতায় রাখার দায়িত্ব পালন করছে কিন্তু আমেরিকা। তারপরও খান সাহেবদের বিশ্বাস করানো হয় - আমেরিকা গনতন্ত্রের সোল এজেন্ট। তেমনি বাংলাদেশের একদল মানুষকে বিশ্বাস করানো হয়েছে - শেখ মুজিব একদল ব্যর্থ শাসক আর তার ছেলেরা খারাপ - সুতরাং তাকে মরে যেতে হবে। যদি তাই হয় তবে জিয়াউর রহমানকেওতে একই ভাবে মরতে হলো - তাকেও কি আমরা ব্যর্থ শাসক বলবো? কিন্তু সেটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে না - কারন আমাদের ভাবানো হচ্ছে না। সত্য অনেক ভাবে দেখা যায়, যেমন প্রচারিত সত্য (৯/১১ ঘটনা মুসলমানরা ঘটিয়েছে, কিন্তু জার্মান কোর্ট যখন আমেরিকার কাছে প্রমান চেয়েছে তারা সেটা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় একজন নির্দোষ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে), খন্ডিত সত্য (যা আসলে ভয়াবহ আর প্রচন্ড বিপজ্জনক, যেমন অথবা হামাস একটা টেররিষ্ট সংগঠন - এটা খন্ডিত সত্য, শুধু এটুকু সত্য জানার পর যদি কেহ থেমে যায় তার পক্ষে হামাসকে সব সর্বনাশের কারন ভাবা ছাড়া অন্য পথ থাকবে না - প্রকৃত সত্যটা হচ্ছে ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে সকল প্রক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন একদল মানুষের মুক্তির শেষ চেষ্টা হিসাবে হামাসের মতো কর্মকান্ড কর্ম কান্ডের) আর শেষেরটা হচ্ছে প্রকৃত সত্য। যা বুঝতে হলে বিবেকের কাছে যেতে হয়, প্রচারিত মিডিয়ার ডামাডোলের বাইরে গিয়ে বড় চিত্রটাকে দেখা এজন্যে জরুরী। একই ভাবে শেখ মুজিবের হত্যাটাকে একটা নিছক হত্যাকান্ড হিসাবে না দেখে বৃহৎ পরিসরে ভাবা দরকার। দেখা দরকার শেখ মুজিব কি ছিলেন - সে বেচেঁ থাকলে দেশেটাতে কি হতে পারতো আর তার মারা যাবার ফলে কে এবং কারা লাভবান হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ কোথায় যারা কথা ছিল আর আজ কোন পথ ধরেছে। যে কোন রাজনৈতিক ঘটনা জানার জন্যে - জানতে হবে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেলে চলবে না - নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষন করতে হবে পারিপার্শিক অবস্থাকে - তবেই সম্ভব হবে প্রকৃত সত্যটাকে জানা।

(৫)

ইদানিং ডঃ বিপ্লব পাল বেশ বাজার গরম করছেন। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক একটা সুপিরিয়র ভাব নিয়ে বাংলায় লিখে জ্ঞান দানে ব্রত হয়েছেন। সমস্যাটা হতোনা যদি উনার ডক্টরেটের সীমানাই থাকতেন। দাদা, একটু লক্ষ্য করে দেখবেন - বাংলাদেশের মানুষ কাকে নেতা মানবে বা মানবেনা তার ভাবনা কিন্তু তাদেরই - আপনার নাক গলানো বা উপযাজক হয়ে জ্ঞান দান কিন্তু ভব্যতার মধ্যে পড়ে না। আপনার মনোভাব আসলে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতে সার্বিক মনোভাবেরই প্রতিফলন - যে কারনে ভারত কখনই সন্মানজনক ভাবে বাংলাদেশের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা ভাবেনি। এবার আসুন আপনার উপস্থাপিত কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলা যাক -

১) ফারাক্কা বাধঁ - পৃথিবীতে এমন কোন নজির নেই উজানের দেশে একতরফা ভাবে পানি নিয়ে যায়। বাংলাদেশ যখন আলোচনায় যায় তখন নানান ভাবে ভারত আলোচনা দীর্ঘায়িত করে। একটা কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা দরকার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর একক দাবী ভারত করতে পেরেছে কারন ভারত শক্তিশালী দেশ।

২) বানিজ্যিক ভারসাম্য - একটু খবর নিয়ে দেখুন - বাংলাদেশের সাথে ভারতে বানিজ্যিক ভারসাম্যটা কোনদিকে ঝুলছে? একটা সদ্য স্বাধীন দেশকে স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়ে সামান্য সহায়তা না করে নানান ভাবে বাংলাদেশের বাজার দখল করার সকল প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশটাকে এখন আর ভারত থেকে আলাদা করা যায় না - কাঁচা বাজার থেকে রাস্তার বাস পর্যন্ত সবই ভারতীয়। লিভিং রুমের টিভি থেকে যুবক-যুবতীদের পোষাকে ভারত। তারপরও যদি কেহ বলে বাংলাদেশ বাজার হিসাবে ছোট তাহলে তাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। আপনি বলছেন - বাজারের জন্যে চাই ক্রেতার পকেটে টাকা । রাজনৈতিক স্তিতিশীলতা। দাদা - এ তত্ত্বটা কোথায় পেলেন আপনি। বাজারের জন্যে রাজনৈতিক স্থিতি - এতো ভালই হলো। যদি বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিরতা আসে তবে বাংলাদেশেইতো উৎপাদন বাড়বে - তখন বাংলাদেশে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বাড়বে - কেন মানুষ ভারতে যাবে পন্যের জন্যে। আর টাটা বিড়লার বাজারের টার্গেট কিন্তু বাংলাদেশ না - অন্য দেশের বাজার আর তাদের টার্গেট সস্তা শ্রম আর সস্তা গ্যাস - যাতে তুলনামুলক কম দামে পন্য উৎপাদক করে ভারতেই বাজারজাত করা যায়। বাজার আর উৎপাদন বিষয়টা আপনার কাছে পরিষ্কার না। আমেরিকান কোম্পানি যেমন সস্তা শ্রমের লোভে চীনে যাচ্ছে - সেখানে গনতন্ত্র বা রাজনীতি কোন বিষয়ই নয় - তেমনি টাটা বাংলাদেশে যাবে আর সবচেয়ে বেশী ভারতবিরোধী কথা বলার জন্যে বিখ্যাত দল জামাতের আমীর নিজামী লাল কার্পেট বিছিয়ে অপেক্ষা করবে - এখানেই তো পুঁজির ভেলকি। এটা বুঝার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার দরকার নেই। সমস্যা একটাই - কোন একটা বিষয়ে ডক্টরেট করেই যদি মনে করেন যে সব বিষয়ে জ্ঞানদানের অধিকার অর্জন করেছেন তবে সেটা অবশ্যই অসুবিধার। একটা কথা মনে রাখবেন - বাংলাদেশের রাজনীতিতে দু'নেত্রী যতটানা প্রভাব তারচেয়ে বেশী প্রভাব পুঁজির মালিকদের আর তাদের একটা বড় অংশ এখন ভারতের পুঁজির মালিকদের সাথে একাত্ব। একটু খবর নিয়ে দেখবেন কি সরকারী দল বা বিরোধী দল - অনেক এমপি - মন্ত্রীর ব্যবসা প্রতিষ্টার ভারতীয় প্রতিস্টনের সাথে যৌথ ভাবে কাজ করছে। যেমন এক মন্ত্রী আর নামজাদা মুখ্যমন্ত্রীর মিলে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন বাজারের বেশীর ভাগ অংশ নিয়ন্ত্রন করে। সর্বশেষ খবর - বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে আরো চাপ দিচ্ছে করনীতি উদারীকরনের জন্যে এবং এর জবাবে অর্থমন্ত্রী বলছে - বাংলাদেশ ঐ অঞ্চলের দেশ গুলোর থেকে বানিজ্য উদারী করেন অনেক এগিয়ে - ফলে বাংলাদেশ ভারতের অবাধ বাজারে পরিনত হয়েছে।

৩) বাংলাদেশের মানুষের মনোভাব জানতে হলে - একটু দয়া করে বাংলাদেশে বেড়াতে যাবেন। দেখবেন ঢাকার অদুরেই দু'টা বড় সেতু আছে যার একটা নির্মানে সহায়তা দিয়েছে চীন আর একটা জাপান আর ভারত শুধু মাত্র চেষ্টা করছে সেই সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী বাসগুলো বিক্রির ব্যবসা করতে। অন্যদিকে মানুষের কাছে ভারতের একধরনের বানিজ্যিক আগ্রাসী মনোভাব স্পষ্ট দিনে দিনে। অন্য একটা উদাহরন দেওয়া যাক, বাংলাদেশে এখন চলছে ক্রিকেট ক্রেজ। এই সময় বাংলাদেশের দল তেমন ভাল ফলাফল করতে না পারায় ভারতের দলনেতা বাংলাদেশকে ২য় শ্রেনীতে নামানোর প্রস্তাব দেয় এবং ভারতে বাংলাদেশের দলের সফর তিনবার বাতিল করে। এ ধরনের আচরন ইংরেজদের থেকে স্বাভাবিক হলেও একটা প্রতিবেশী দেশের থেকে আশা করা যায় না। নব্য টেস্ট স্টেটাস পাওয়া বাংলাদেশ কি প্রতিবেশী ভারতের থেকে একটু সহায়তা পেতে পারতো না? যেখানে শ্রীলঙ্কা নানান ভাবে সহায়তা দিচ্ছে সেখানে ভারতের এহেন হামবড়া ভাবের পর কি আপনি আশা করে বাংলাদেশের মানুষের মনে কি ধরনের বিরুপ প্রভাব পড়বে তা বুঝার জন্যে বোধ হয় ডক্টরেট করার দরকার হবে না।

৪) শেষ কথাটা বলি - ভারতের বিরাট গনতন্ত্রের কথা শুনে আমরা যতটানা টান অনুভব করি তার ছেয়ে বেশী হতাশ হই গুজরাটে নির্বিচারে মানব নিধনের খবরে, ব্যথিত হই পশ্চিম বংগে আইন করে বাংলা ভাষা রক্ষার কথা শুনে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন কথা বলার আগে আপনার আরও একটু জানা দরকার। আতিথেয়তা ছাড়াও বাংলাদেশের গর্ব করার মতো অনেক বিষয় আছে - সেটা দেখার জন্যে আপনার দৃষ্টির সামনে থেকে বড়ত্বের ভাবটা কাটানো জরুরী। ১৯৪৭ সালের এক ভুলের মাসুল দিতে ২৪ বৎসর সংগ্রাম করে ১৯৭১ সালে একটা স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্বপ্রকাশ করে। আবার সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে ১৯৭৫ সাল থেকে গনতন্ত্রের অগ্রযাত্রা রহিত হয়। তারপর দীর্ঘ নয় বৎসর সংগ্রাম করে ১৯৯০ সালে আবার একটা গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ প্রবেশ করে। দীর্ঘ দেড় যুগের

সামরিক শাসনের সুযোগে ভারত তার বাজার সংহত করে বাংলাদেশে। সামরিক শাসকরা ভারতের আনুকূল্য পেয়ে দীর্ঘদিন শাসন করেছে সে বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। যে দুই মহিলাকে আপনি "নির্বোধ" বলছেন – এই দুই মহিলা একটা ৯ বৎসর দীর্ঘ গনতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে পরিপুর্ন হয়েছেন এবং গনতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত হয়ে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর আপনার ভারতে একজন নেতার অভাবে ইটালী থেকে আসা শুধু বৈবাহিক সুত্রে ভারতীয়কে বেছে নেওয়া ছাড়া বিকল্প ছিল কি? আপনি মনমোহন সিং এর কথা বলছেন – কিন্তু আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন তার প্রান ভোমড়া সোনিয়া গান্ধীর আচঁলে বাঁধা। এবারকি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি – একশত কোটি মানুষের দেশে কি ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো একজন মানুষ ছিল না – যে তাদেরকেকে ইটালী থেকে একজন গৃহবধুকে কে আমদানী করতে হয়েছে? আর ভারতের প্রেসিডেন্ট দেশের শাসন বা পরিকল্পনায় কতটা অংশগ্রহন করে তা যদিও আপনার জানা না থাকতে পারে কিন্তু আমরা জানি। একটা ডেকরেশান পিস হিসাবে বিজেপি সরকার একজন সংখ্যালঘুকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করে সংখ্যালঘুদের ভোট টানার চেষ্টা করেছে – এটা বুঝার মতো মেধা আপনার নেই সেটা ভাবতে কষ্ট হয়। বাংলাদেশের মতো একটা ভারত বেষ্টিত দেশ – যারা নিজেদের বাজার হিসাবে বাংলাদেশকে দেখতে ভালবাসে আর তাদের সদ্য আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সাথে দহরম মহরমের বাজারে বিপ্লব পালদের এহেন তত্ত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের সতর্ক থাকা দরকার। দীর্ঘ দেড় যুগের সামরিক শাসনের পর অর্জিত গনতন্ত্র যখন বাংলাদেশে বিকশিত হচ্ছে তখন বিপ্লব পালেদের বাংলাদেশের বিষয়ে এই ধরনের উন্নাসিক মন্তব্য একটা সন্দেহের কারন বৈকি। সবশেষে পাল মশাইকে বলছি –মুক্তিযুদ্ধের মিত্র ভারতকে যেখানে সন্মানের সাথে স্মরন করার কথা সেখানে ভারতকে বাংলাদেশের মানুষ বিরোধীতা করে বলে পাল মশাই কষ্ট পাচ্ছেন এবং দু'নেত্রীকে নির্বোধ বলে গাল দিচ্ছেন – এই লজ্জাটা কার? কোন কারনে আপনার মনে হলো ভারতকে তাবেদারী না করলে বাংলাদেশের অস্থিত্ব থাকবে না? বাংলাদেশে ভারত বিরোধীতার যৌক্তিক কারনগুলি না খুঁজে বাংলাদেশে নেতৃদের সম্পর্কে অযাচিত জ্ঞানদানে ব্যথিত হয়ে বলতে হচ্ছে – কবে যে মশাইরা নিজের অহমের বাইরে এসে অপরকে সন্মান করতে শিখবেন সেটাই দেখার অপেক্ষায় থাকলাম।

(৬)

বাংলাদেশে একটা চমৎকার বোমার মহড়া হয়ে গেল। যথারীতি সরকার আর বিরোধী দল পরস্পরকে দোষারোপ করে গেল। এতে পুলিশের সুবিধা হলো – কারন তাদের আর কিছু করার দরকার নেই। বোমা হামলা কে করেছে আর কেনই বা করছে তা জানা বাংলাদেশের জন্যে জরুরী। নতুবা একদিন দেশটা একটা বোমার গুদামে রুপান্তরিত হবে। আমার বিশ্বাস সরকার আর বিরোধী দল ভালভাবে জানেন যে কে বা কারা বোমা হামলার সাথে জড়িত। না হলে কেন পরস্পরকে দোষারোপের মাধ্যমে প্রকৃত হামলাকারীদের বাঁচানোর লক্ষ্যে তাদের এই প্রয়াস? দয়া করে এই সর্বনাশা খেলা বন্ধ করুন। দেশে স্বার্থে এই বিষয়ে ঐক্যমত্য হোন এবং প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের সন্মুখিন করুন। নতুবা এই বোমার নীচে আপনারাও চাঁপা পড়ে যাবেন।

সবাই ভাল থাকুন

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো, আগষ্ট ২০, ২০০৫